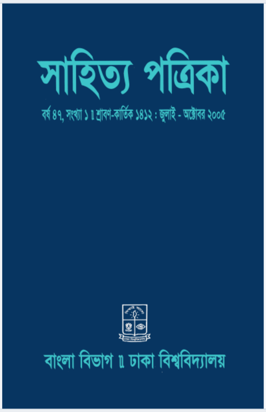

Vol. 47 | No. 1 | 2005

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পদ্মানদীর মাঝি : শিল্পরূপ

Volume	47
Issue	1
Year	2005
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ
Published online	October 1, 2005
DOI	10.62328/sp.v47i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i1.5
Pages	৭৯-১০২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পদ্মানদীর মাঝি : শিল্পরূপ

মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'জননী' (১৯৩৫) ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র (১৯৩৬) পর লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাস। প্রথম তিনটি রচনায় নিম্নমধ্যবিত্ত ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। অন্য দিকে 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রধানত অন্ত্যজ শ্রেণীর কাহিনী। এ উপন্যাসে সামন্ত-অবশেষ হলো মেজকর্তা। হোসেন মিয়া ধূর্ত ব্যবসায়ী ও রহস্যময় উপনিবেশবাদী হয়েও কেতুপুরের মাঝিদের মধ্যে মিশে আছে অন্তরঙ্গভাবে। তাদেরই যেন অপরিহার্য অংশ সে। কেতুপুরের অন্য সবাই জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের বাস্তব জীবনই এ উপন্যাসের বিষয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' কেতুপুরের দারিদ্র্যপীড়িত জেলে-মাঝিদের নিত্য দিনের কঠোর পরিশ্রম, তাদের ওপর চেপে বসা শোষণ-বঞ্চনা এবং ব্যক্তিক, পারিবারিক ও গোষ্ঠীজীবনের সমস্যাবলির একটি নিখুঁত উপাখ্যান। নায়ক কুবেরের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক কেতুপুরের বৃহত্তর সমাজ ও গোষ্ঠী জীবনের নানা সমস্যা চিত্রায়িত করেছেন। কুবেরের মধ্য দিয়েই সরল-অসহায় জেলে-মাঝিদের সংসার-সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের করুণ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। কুবেরের সঙ্গী গণেশ, ধনঞ্জয়, রাসু, পীতম মাঝি প্রমুখ সকলেই পদ্মাতীরের সহায়হীন মানুষ। তারা 'মেজকর্তা'র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন শোষণে যেন অবাঞ্ছিত কতকগুলো প্রাণী। সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচার কোন অনুকূল অবস্থাই তারা রচনা করতে পারে নি। ফলে সামন্ত শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহসও তাদের হয় নি কোন দিন। যেন আজন্ম ক্রীতদাস তারা। এ অসহায় জেলেদের জীবনে হোসেন মিয়ার আগমন ঘটে রহস্যময় মানুষ হিসেবে। সে 'ময়নাদ্বীপ' নামের উপনিবেশ গড়ার অন্তরালে পাতে চতুর ফাঁদ ; নদীর মোহনায় মাত্র জেগে ওঠা চরে কেতুপুর থেকেই মানুষ ভাগিয়ে নিয়ে বসতি গড়তে চায় এই উপনিবেশবাদী। হোসেন মিয়ার সে নিষ্ঠুর ফাঁদে পড়ে রাসু জীবন্মৃত হয়ে ফিরে এসেছিল ; আর অনিবার্য পরিস্থিতির শিকার হয়ে কুবেরকে অবৈধ প্রণয়সঙ্গিনী কপিলাকে নিয়ে ছেড়ে যেতে হয়েছিল কেতুপুর গ্রাম ও তার স্ত্রী-সন্তানদের।

* পিএইচ. ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকৃতি ও সমাজপ্রভুদের সমান্তরাল বৈরিতার মুখে সংগ্রামশীল জেলে-মাঝিদের জীবনের সুনিপুণ চিত্র এ উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবতা, অশিক্ষিত ও কষ্ট নিপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত, ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জীবনপরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশে অনিবার্য আকর্ষণ 'পদ্মানদীর মাঝি' বই খানিতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই এ উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় সার্থকতা অর্জন করেছে।[১]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে, ভাষা ও অলঙ্কার ব্যবহারে ঔপন্যাসিক অসাধারণ পরিমিতিবোধ অনুসরণ করেছেন। এ কারণে উপন্যাসটি হয়েছে শিল্পসফল।

> এই গ্রন্থের কোথাও আতিশয্য নেই, অতিরঞ্জন নেই — দুঃখকে তিনি যেমন অকারণে বাড়িয়ে দেখেন নি, সুখকে তেমনি দেন নি অপ্রাপ্য মহিমা — শিল্পের চেয়ে জীবনই তাঁর কাছে গভীরতম সত্য। 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পর্কে এ মন্তব্য সর্বদাই প্রযোজ্য বলে মনে করি। সে জন্যেই এ-গ্রন্থে শিল্পের কারুকার্যের আড়ালে জীবনের এত বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটে ওঠে।[২]

'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের শিল্পরূপ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> ... উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্ন শ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা নির্দেশ।[৩]

সাতটি পরিচ্ছেদে গড়ে উঠেছে 'পদ্মানদীর মাঝি'। প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছে। কেতুপুরের ও জেলেপাড়ার পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জমিদার কর্তৃক জেলেদের শোষণ, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং অসহায় এক জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার সংগ্রামের বাস্তব চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। কুবেরের নবজাত সন্তানের কান্নার মধ্য দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক জেলেদের লোকজ জীবনের পরিচয়, তাদের পূজা-পার্বণ, মেলা ও উৎসবের কথা বলেছেন। এর পর তিনি দিয়েছেন কুবেরের পরিবার পরিস্থিতির বিবরণ : তার ভাঙা ঘর, আসবাবপত্র, চালের ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়া, কুবেরের চিড়া খাওয়া, খাওয়ার পর থেকে যাওয়া অতিরিক্ত চিড়া নিয়ে তার ছেলে লখা ও চণ্ডীর কাড়াকাড়ি, স্ত্রী মালার স্যাঁতসেঁতে আঁতুড় শয্যায় নির্মোহ বক্তব্য—সবকিছু। উপন্যাসের এ পর্যায়ে বা পরিচ্ছেদে হোসেন মিয়ার আগমন। সে কেতুপুর গ্রামের নতুন প্রতিনিধি, তার অতীত ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। বর্তমানের আর্থিক সাফল্য, ব্যক্তিত্ব অর্জন ও প্রভুত্বকামিতা, দরিদ্র মাঝিদের ভোলাতে চাতুর্যের প্রয়োগ, পরোপকারের নামে স্বার্থ

উদ্ধার, বিচিত্র আইনী-বেআইনী ব্যবসায়ে তার সফলতা, এক নতুন চরে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তার সামন্ত প্রভু হওয়ার বাসনা এবং এ প্রসঙ্গে গ্রামের লোকদের তার পক্ষে-বিপক্ষে পোষিত মনোভাব প্রভৃতির উপস্থাপন ঘটেছে এখানে। এ পরিচ্ছেদেই কুবেরের ঘরে চাটাইয়ে চিৎ হয়ে শুয়েছিলো হোসেন মিয়া এবং এখান থেকেই উপন্যাসে তার প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পাই আমরা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুবের তার মেয়ে গোপীকে বিয়ে দেয়ার কথা ভাবে, এবং এ বিয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু টাকা পাওয়ার সম্ভাবনাও সে দেখে। পরিচ্ছেদটিতে এক দিকে মালার বাল্য স্মৃতি ও তার সন্তান পালনের কথা, অন্য দিকে কুবের ও মালার দাম্পত্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে অনেকগুলো ঘটনার উপস্থাপন। রাসুর ফিরে আসায় গ্রামবাসীর মধ্যে হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তার অবসান ঘটে হোসেন মিয়ারই দৃঢ়তায়। নতুন করে সংসার সাজানোর চিন্তা এবং গোপীকে পাওয়ার কামনায় যেন জেগে ওঠে রাসু। এ সব ঘটনার পটভূমিতেই চরডাঙা থেকে মালার বোন কপিলার আগমন কেতুপুরে। কপিলার চলে আসা, তার চঞ্চলতা, রহস্যময় ব্যবহার, সেবা-যত্ন, ছলা-কলা কুবেরকে করে আন্দোলিত, রোমাঞ্চিত। তার মগ্ন চৈতন্যে অবস্থিত কামনার বীজ হয় অনুপ্রাণিত। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঝড়ের তাণ্ডব আসে কেতুপুর গ্রামে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে হোসেন মিয়া। সে সবাইকে খত-বন্দী করে সাহায্যের ব্যবস্থা করে। হোসেন মিয়া অতিরিক্ত খাতির করে কুবেরকে এবং কুবের তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়। গোপীর আঘাতিত পা নিয়ে বিব্রত কুবের। অন্য দিকে, কপিলার সঙ্গে তার স্থাপিত হয় রঙ্গরসের সম্পর্ক। ধীরে ধীরে এই রঙ্গময়ী-লাস্যময়ী-লীলাময়ী নারী কপিলা কুবেরকে করে উদ্‌ভ্রান্ত, বিমুগ্ধ। দেখা যায়, অসুস্থ গোপীকে নিয়ে কুবের, কপিলা, গণেশ, যুগী ও রাসু আমিনবাড়ি যায়। গোপীর চিকিৎসার অন্তরালে কুবের ও কপিলার সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরও অন্তরঙ্গ। এ পরিচ্ছেদে সর্বস্ব হারানো রাসুর বিয়ের বাসনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে, সে গোপীকে পাওয়ার জন্যে কুবেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে এক ধরনের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ অংশে যখন কুবের ও কপিলার সম্পর্ক হয়ে ওঠে প্রায় অনিবার্য, তখনই কপিলার স্বামী শ্যামাদাস এসে কপিলাকে নিয়ে যায় আকুরটাকুর। কপিলার অবর্তমানে কুবের বুঝতে পারে তার প্রতি কুবেরের প্রেম ছিল কত তীব্র।

এ উপন্যাসের শেষ ও দীর্ঘতম অংশ সপ্তম পরিচ্ছেদ। এখানে ঘটনার পর ঘটনার আগমন ঘটেছে এবং এ সবের মধ্য দিয়েই কাহিনী লাভ করেছে পরিণতি। এক দিকে শেষ ইলিশের মৌসুম, অন্য দিকে ধনঞ্জয় তার নৌকোয় কাজে নেয় না কুবেরকে। অর্থাভাবে পড়ে কুবের। এমন সময় কুবের ও গণেশ চাকুরি পায় হোসেন মিয়ার নৌকায়। তারা হোসেন মিয়ার ব্যবসার মালামাল বন্দরে-বন্দরে পৌঁছে দেয়। এবং ময়নাদ্বীপও যায় সেখানে বসতি স্থাপনে আগ্রহী লোকদের নিয়ে। হোসেন মিয়ার সংস্পর্শে এসে কুবের ফিরে পায় আর্থিক সচ্ছলতা, সঙ্গে সঙ্গে সে কপিলাকে পাওয়ার

বাসনায়ও হয়ে ওঠে আগ্রহী। সে বিনা কারণে আকুরটাকুর যায় কপিলাকে দেখতে। কিন্তু কুবের শত চেষ্টায়ও কপিলার মন বুঝতে পারে না। এ দিকে দ্বিতীয় বার চিকিৎসায় গোপীর পা ভালো হওয়ার আশা ব্যক্ত করেছে ডাক্তার। এর আগেই গোপীকে রাসুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথা দেয় কুবের। কিন্তু পাঁচ কুড়ি টাকা পণ ও তিন কুড়ি টাকার গহনা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে, হোসেন মিয়ার মধ্যস্থতায় গোপীর বিয়ে হয় বঙ্কুর সঙ্গে। বোনঝির বিয়েতে অতিথি হয়ে কেতুপুরে আবার কপিলার উপস্থিতি। এ বিয়ের আনন্দের দিন শেষ না হতেই কুবেরের বিরুদ্ধে রাসুর ষড়যন্ত্র পাকা হয়ে যায়। পীতম মাঝির চুরি হয়ে যাওয়া টাকা ভর্তি ঘটটি টাকা শূন্য অবস্থায় কুবেরের ঘর থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। কুবেরের বিরুদ্ধে মামলা হয় থানায়, পুলিশ ও চৌকিদার অভিযুক্ত কুবেরকে ধরে নিয়ে যেতে পারে যে কোন সময়। তখন কেতুপুরে উপস্থিত কপিলা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। বাড়িতে অনুপস্থিত হোসেন মিয়ার কাজে ব্যস্ত কুবেরকে এ দুঃসংবাদ দিতে কপিলা তাই গভীর রাতে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ায়। এ সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হোসেন মিয়ার অনুগত হওয়া। কপিলার দ্বিমত সত্ত্বেও কুবের হোসেন মিয়ার বশ্যতা মেনে ময়নাদ্বীপে যেতে সম্মত হয়। অবশেষে কুবের কপিলাকে সঙ্গে নিয়ে ময়নাদ্বীপের পথে নৌকো ভাসায়। এ ভাবেই গড়ে উঠেছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি।

এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা সেট্‌লমেন্টের কর্মচারী হিসেবে কিছুদিন অবস্থান করেন পদ্মানদীর তীরে। সে সময় :

> মানিকের সেইখানেই পদ্মার সঙ্গে পরিচয়। পদ্মার ভীষণ সৌন্দর্য তাঁকে আকর্ষণ যত না করত, তার চেয়ে বেশি করত তার তীরবর্তী মানুষের জীবনধারা। সেই পুঁজি নিজের মানসের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি এ বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সন্ধান দিলেন। তাঁর পূর্বে স্থানিক সাহিত্যে রাঢ়বঙ্গ–বাংলার প্রত্যন্তে অবস্থিত কয়লাখনির এলাকা ফুঠে উঠেছিল শৈলজানন্দের কলমে, তাঁর কুশীলবেরাও আঞ্চলিক ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গত তখনো ছিল পাণ্ডববর্জিত। সেই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলকে তিনি নিয়ে এলেন সাহিত্যের দরবারে, তার ব্রাত্য মানুষকে এনে নায়ক-নায়িকার পাদপীঠে বসালেন।[৪]

প্রকৃত প্রস্তাবে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রায় অনন্য সৃষ্টিধর্মিতা ও সহমর্মিতার সমন্বয় ঘটার ফলেই 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতো একটি জীবনঘনিষ্ঠ রচনা সম্ভব হয়েছে।

সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত কাহিনীর মধ্যে অতিরিক্ত কোন মেদ নেই। কাহিনী পূর্বাপর পরিমিত পরিসরে বিন্যাস্ত, বাহুল্য বর্জিত। জেলেদের দারিদ্র্য নিয়ে অনেক অতি কল্পনা ব্যাপক পরিসরে সম্ভব ছিল। দারিদ্র্যবিলাস থেকে অনেক লেখকই মুক্ত হতে পারেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন সাদা চোখে, স্বপ্নালু দৃষ্টিতে নয় ;

সে কারণে কোন ভাবালুতা সাধারণত তাঁকে আক্রমণ করতে পারে নি। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে তাঁর বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থেকেছে। দরিদ্র কুবের ও তার পরিবারের এবং একই সঙ্গে কেতুপুরের অন্যান্য মানুষের যে পরিচয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন তার কোন অংশই পরিত্যাজ্য গণ্য হওয়ারও নয়। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। এ ভাবে প্রবাহিত কোন কাহিনী-অংশই কখনও অপ্রয়োজনীয়, অপাংক্তেয় মনে হয় না। ঘটনাবলির অনিবার্যতা এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কোন কাহিনী-অংশ বাদ দেওয়ার উপায় নেই। এমন কি টাকা-চুরির ঘটনা, গ্রামে পুলিশের আগমন, ময়নাদ্বীপ থেকে রাসুর ফিরে আসার কারণে হোসেন মিয়ার প্রতি গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, হোসেন মিয়ার মাদক দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা প্রভৃতি ঘটনা যে কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের হাতে ব্যাপকভাবে পল্লবিত হতো। কিন্তু, মিতবাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্তিতে 'মাঝি'র কাহিনী রচনা সুসম্পন্ন করেছেন। অথচ মানুষ ও প্রকৃতি বর্ণনায় কোন ঘাটতি নেই। রস ও সৌন্দর্যেরও নেই কোন কমতি। শেক্স্‌পীয়রের ট্রাজেডিগুলোর কাহিনীর কোন অংশই পরিত্যাজ্য মনে করা যায় না। 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা চলে নির্দ্বিধায়। তার কাহিনী এতই সাবলীল যে, যে কোন পাঠকই প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রবাহিত হন যেন তাঁর অজ্ঞাতেই। কোন অংশই কৃত্রিম, স্বকল্পিত ও আকস্মিক মনে হয় না। কাহিনী অগ্রসর হয়, বাঁক নেয়, সমস্যায় নিপতিত হয় কিংবা মুশকিল আসান হয় যেন নিজ গুণে। কোন সময় লেখকের উপস্থিতি অনুভব করা যায় না। কোন ঘটনার ব্যাখ্যায়, কোন ঘটনার উপস্থাপনায় লেখকের চাপিয়ে দেওয়া কোন জীবন দর্শনের সাক্ষাৎও মেলে না। বস্তুত, ঔপন্যাসিক তাঁর রচনা থেকে অতি উচ্চ মাত্রার বিচ্ছিন্নতা পূর্বাপর অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এ সবই 'পদ্মানদীর মাঝি'কে দান করেছে একটি ঈর্ষণীয় উচ্চমান। 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রধান প্রধান চরিত্র কুবের, হোসেন মিয়া, মালা ও কপিলা। এগুলো ঘিরে আবর্তিত হয়েছে অন্যান্য চরিত্র।

অসংখ্য সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল থেকেও জীবনের অফুরন্ত সীমাবদ্ধতা ভেঙে ফেলতে পারে নি কুবের। কোন রাজনৈতিক আদর্শে সে দীক্ষিত নয় যে আপসহীন হবে। বিশ্বের কোটি কোটি নিষ্পেষিত গরিবের সে একজন। সে গরিব এটাই তার প্রধান পরিচয়। সমাজপতিদের পাতা শোষণের জালে তার বন্দীত্ব সে বরণ করে নিয়েছে। সমাজ-সংসারের সব প্রতারণা-প্রবঞ্চনা নিয়েছে মেনে। জমিদারের কর্মচারী, সঙ্গতিহীন সিধু দাসও ঠকায় কুবেরকে। এমন অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে পদ্মায় মাছ ধরে, ছ জনের সংসার চালায় সে। পৃথিবীতে মালা ও গণেশই তার অনুরাগী। তাকে ভালোবাসে, সম্মান করে । তার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত,

> সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে সে। প্রতিবাদ করিতেও পরিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার, অধিকার তাহার নাই।[৫]

তার জন্ম শ্রেণী-শোষণ-মূলক সমাজ কাঠামোর মধ্যেই। সেখানে জমিদার বা অর্থ-বিত্তশালী মাত্রই যেন নিয়ম মাফিক ঠকিয়েই চলেছে দরিদ্রকে। গরিব জেলে কুবের তাদের থাবার বাইরে নয়। শ্রেণী বৈষম্যের শোষণ-পীড়নে কুবেরের মনও যেন গেছে ছোট হয়ে ; সে মহা আতঙ্কের শিকার। সে কারণেই কোথাও সে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াতে পারে না নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। সে ভয় পায়। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয় খুড়োকেও সে ভয় পায়। সে কারণে, প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাকে চোর সাব্যস্ত করতে পারে না কুবের। তার নিশ্চিত ভয়, তা হলে তাকে আর মাছ ধরতে নেবে না নৌকোয়। সে ভীত হোসেন মিয়ার নামেও, সে জন্যেই সে ময়নাদ্বীপ না যাওয়ার কথা সামনা সামনি বলতে পারে না। এমন কি মিথ্যা মামলার মোকাবেলা করার সাহসও নেই তার। অনন্ত বাবুকে পর্যন্ত সে ভয় পায়। তার প্রতি কুবেরের সঞ্চিত ক্ষোভের কখনও প্রকাশ ঘটে নি। বরং তা যেন স্থানান্তরিত হয়েছে মালাকে মারধর করার মধ্যে। সে ভয় পায় কাল্পনিক দেবতাকেও ; নদী তীরের নির্জনতায় কপিলার হাসি শুনে কুবের তাই আঁৎকে ওঠে। অসহনীয় অভাবের কারণে কুবেরের মন বাস্তবিকই ছোট হয়ে গিয়েছে। দারিদ্র্যই কুবেরের জীবনের নগ্ন সত্য; তার পরও পদ্মার 'হেঁয়ালী আচরণ' এবং কপিলার প্রেমের আহ্বানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে যেন আর একজন কুবের। কপিলার আগমনে কুবেরের জীবন হয়েছে যথার্থই দ্বন্দ্বমুখর। কপিলার প্রতি অনুরাগের আগে কুবের ছিল একজন নিষ্ঠাবান সাংসারিক মানুষ। কপিলা কুবেরের জীবনের অজানা এক অধ্যায় যেন করেছে জাগরিত। কপিলাকে পেয়ে কুবেরের চোখে মালার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কপিলার প্রেম মালার নিবেদিত ভক্তির চেয়ে আরও বেশি কিছু মনে হয় কুবেরের কাছে। সম্পূর্ণ নতুন এক সুখের উৎস কপিলা ; সে জন্যে কপিলাই তাকে কাছে টেনেছে। কিন্তু বাস্তবতার কারণে কপিলা যখন চলে যায় শ্যামাদাসের কাছে, তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে কুবের। সুযোগ পেতেই কুবের ছুটে যায় আকুরটাকুর। সেখানে শ্যামাদাসের সংসারে কপিলার সুখ-সচ্ছলতা দেখে সংকুচিত হয়ে ওঠে কুবেরের মন। নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাওয়া কুবের ফিরে আসতে আসতে শ্যামাদাসের সমান সচ্ছল জীবনের কল্পনা করে সে :

> চার ভিটায় চার খানি বড় বড় ঘর তোলে কুবের, গোয়াল করে, ধানের মরাই করে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিয়া দেয়। তারপর একদিন কপিলাকে নিমন্ত্রণ করে। কপিলার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলে যে তাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেরের—ও কপিলা, আমারে ফেইলা যাইস না, যাইস না— আমি নি মইরা গেলাম কপিলা তরে না দেইখা ![৬]

কপিলার প্রেমই যেন কুবেরের জীবনের প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক রীতি-নীতি উপেক্ষা করে কুবেরের পক্ষে কপিলাকে নিয়ে সংসার গড়ে তোলা অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতেই কুবেরের বিরুদ্ধে রাসুর ষড়যন্ত্র সফল হয়। তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে কুবেরকে যেতে হয় ময়নাদ্বীপ, সঙ্গে যায় কপিলা। সংসার-সন্তান ছেড়ে কুবের এ যাত্রায় হয়ে ওঠে এক পলায়নপর মানুষ। সংসারের প্রতি তার এই দায়িত্বহীনতা পরিস্থিতি-জাত। মিথ্যা মামলা প্রতিহত না করে সংগ্রাম-সংঘাতের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে ভীরুর মতো চলে গেল কুবের। তবে, তার মতো গরিবের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। দারিদ্র্যজনিত দুর্বলতার কারণে এরা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়ে থানা-পুলিশের সঙ্গে লড়তে সক্ষম নয়। ধরা পড়লে সংসার ধ্বংস অনিবার্য। পরিস্থিতি এমনই শাঁখের করাত হয়ে ওঠে যে, একটা না একটা বিপর্যয় মেনে নিতেই হয়। কুবের লড়াইজাত বিপর্যয় এড়িয়ে বেছে নিয়েছে পলায়নজাত বিপর্যয়। তার আচরণ তাই নয় অবাস্তব বা অস্বাভাবিক। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা চলে :

> তার নীচুতা সঙ্কীর্ণতা অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কুবের যে একটি উপাখ্যানের নায়ক হতে পারলো, তার মূলে আছে এই অবিমিশ্র স্বাভাবিকতা যাকে আমরা বাস্তবের সঙ্গে সমীকরণ করতে পারি অনায়াসেই। হয়ত আরও তলিয়ে দেখলে কুবেরের চরিত্র চেতন-অবচেতনের নিষ্ঠুর ও রহস্যময় দ্বন্দ্বের মানবিক পরিণতি বলে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে, কী করে অর্থনৈতিক বিন্যাস ও সীমাবদ্ধতা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিকাশ ও অভিব্যক্তির রূপ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করে।[৭]

'পদ্মানদীর মাঝি'র অপর উলেখযোগ্য চরিত্র মালা। পঙ্গুত্ব তার জীবনে একটি প্রধান অন্তরায় হলেও সে কারও থেকে পিছিয়ে নেই। অবশ্য সে নিজ গুণে জেলেপাড়ার অন্য দশ জন মেয়ের চেয়ে আলাদা একটি বিশিষ্টতা যেন অর্জন করেছে। সারাদিন ঘরে বসে সংসারের কাজ করে সে আপন মনে। সন্তানদের যত্নআত্তি করতে সে সব সময় অধীর হয়ে থাকে ; পরম মমতায় নিজ হাতে তাদের খাওয়ায়। রূপকথার গল্প শুনিয়ে তাদের ঘুম পাড়ায়। কুবেরও ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু, স্ত্রীর কাছে পাওয়া এ সুখে আর যেন মন ভরে না কুবেরের। লাস্যময় সুস্থ নারী কপিলার আগমনে সে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সচলা কপিলা অচলা মালার স্বামী-ভক্তিজনিত প্রেম করে দিয়েছে অচল। এটি মর্মে মর্মে অনুধাবন করে মালা। সে আরও বুঝতে পারে যে, কপিলাই তার জীবনের সুখ ও দুঃখের নিয়ামক। কুবের ও কপিলার অবৈধ প্রেম সম্পর্কে অবগত হয়েও মালা থেকেছে নিশ্চুপ। সে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আপস করেছে নবোদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে। কিন্তু তাতে তার অন্তরের জ্বালা হয় নি প্রশমিত। বরং এক দিকে সাংসারিক অভাব-অনটন, অন্য দিকে স্বামীর অসদাচরণ মালার মনকে তুলেছে বিষিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি না পেয়ে মালা মাঝে মধ্যে কামনা করে মৃত্যু ; কিন্তু তা তার মনের কথা নয়। সেখানে বরং আছে সুখের বাসনা। সে কারণেই,

সে আমিনবাড়ি গিয়ে ডাক্তার দেখায় পঙ্গু পা ভালো করার জন্যে। কিন্তু তার পা ভাল হওয়ার নয়। বরং আমিনবাড়ি থেকে ফেরার পর কুবেরের কাছে মালা হয়েছে আরও উপেক্ষিত। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে অভিমানে স্নেহময়ী মা মালা এক সময় নিজ সন্তানকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। এ উপন্যাসে প্রকৃতির অধীন জনগোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতার প্রতীক যেন মালা। সে জন্ম থেকেই পঙ্গু। এ প্রসঙ্গ আলোচনাকালে একজন সমালোচক অবশ্য মালা, কপিলা, গোপী সবাইকে প্রতীকী চরিত্র হিসেবে গণ্য করেছেন :

> নদীর তীরবর্তী মানুষ–তার প্রতীকের মূল্য রক্ষা করতেই যেন পঙ্গু। মালা ও গোপী দুজনের একজন জন্ম থেকে চিরকালের জন্যে, অন্যজন ঝড়ের ফলে সাময়িকভাবে পঙ্গু হয়েছে, তারই পাশে আছে কপিলা যে কিনা চলিষ্ণুতার প্রতিনিধি। উপন্যাস যেমন যেমন অগ্রসর হয়, তেমনি তেমনি জড়িয়ে আসে মৃত্তিকালগ্ন এই তিন নর-নারীর মায়াজাল।[৮]

এই তিন নারী কুবেরকে যেন ঘিরে আছে সারা জীবন। গোপী তার কন্যা, মালা ও কপিলা তার সংসার জীবনের সুমেরু ও কুমেরু। মালা বাস্তব, কপিলা স্বপ্ন। মালার কাছে কুবেরের রয়েছে আশ্রয়, কপিলার কাছে কুবেরের তা নেই, আছে অনিশ্চিত আগামীর সম্ভাবনা। আসলে মালা সংসার যাত্রার নিপুণ পারদর্শিতার এবং স্বামী-ভক্তি ও সন্তান-স্নেহের অপরূপ উপমা। অন্য দিকে কুবেরকে অভিভূত করা কপিলার বেগুনী রঙের শাড়ী, তেলে ভেজা চুল, বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গি, প্রগল্‌ভ-হাসি। এ সবই কুবেরকে কপিলার প্রতি আকর্ষণের সঠিক উপকরণ। এ অবস্থার কারণে মালার অসাধারণ সহিষ্ণু মনোভাব প্রকারান্তরে কুবের ও কপিলার প্রেমের পক্ষে গেছে। কুবের ও কপিলা তাদের প্রেমজাত সংকীর্ণতার কারণে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জগৎ-সংসারে পঙ্গু মালার মৌলিক অধিকারের কথা ভাবে নি। এবং মালাও সোচ্চার হয়ে এ অবৈধ প্রেমের বিরোধিতা করে নি। সে মোকাবেলার পক্ষে না গিয়ে গোপনে বরং ডাক্তার দেখিয়ে পা ভালো করার চেষ্টা করেছে। সে ভেবেছে হয়তো সুস্থ নারীর অবস্থায় ফিরে গিয়ে সে আদায় করে নিতে পারবে স্বামীর সুখ-সম্পদ। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং সে বাধ্য হয়ে নিরবে সব সয়ে গিয়েছে আপন বৈশিষ্ট্যে। তার সহিষ্ণু মনোভাবের সামাজিক মর্যাদা থাকলেও অথবা অন্যদের সমবেদনা তার প্রতি থাকলেও তার নিজ অস্তিত্ব এর ফলে যেন অনিবার্যভাবেই বিলীন হয়ে গেছে, হয়েছে অর্থহীন। কুবের ও কপিলার অবৈধ প্রেমের বিরোধিতা না করা যেন মালার শারীরিক পঙ্গুত্বের মতোই স্বাভাবিক। তবু মালার এই নিরবতাই তাকে যেন দান করেছে এক ধরনের মহিমা।

কপিলা আমাদের সামনে এসেছে স্বামী-সংসারের অবহেলাগ্রস্ত নারীরূপে। স্বামীর কাছে সে পায় নি তার কাঙ্ক্ষিত সংসার ও সন্তান। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পরই তার স্বামী

শ্যামাদাস এসেছে তার খোঁজে। তার আগ পর্যন্ত শ্যামাদাস কপিলার খোঁজই করে নি। অবহেলিত দেহ-মন নিয়ে বন্যাকবলিত চরডাঙা থেকে কুবেরের সঙ্গে কপিলা আসে কেতুপুর। এবং কেতুপুরের বন্ধনমুক্ত পরিবেশে, শ্যামাদাসের অবহেলার পটভূমিতে, কুবের ও কপিলার প্রেমের সূত্রপাত হয়। অনুরাগ, ছলাকলা ও রহস্যময় আচরণে কপিলা যেন বন্দী করেছে কুবেরকে। ঘরে ফেলে আসা তামাক কুবেরকে নদীর ঘাটে পৌঁছে দিতে গিয়ে কপিলা তার হাত ধরে টান দেয়, যেতে চায় কুবেরের সঙ্গে নৌকোয়। কুবেরের স্নেহবিজড়িত শাসনে কপিলা আহ্লাদিত কণ্ঠে 'আরে পুরুষ' বলে ঠাট্টা করে কুবেরকে। ঐ ঠাট্টা তথা ব্যঙ্গের মাধ্যমে কপিলা কুবেরের পৌরুষ জাগ্রত করতে চায়। এ ভাবে কপিলা সমাজবিগর্হিত প্রেমের পথে নিয়ে আসে কুবেরকে। মালার পঙ্গুত্বজাত নানা অপারগতা এত দিন ছিল যেন কুবেরের চোখের আড়ালে ; এখন যেন তা প্রকটতর। সংসারিক জীবনে মালার অবদান লাস্যময়ী সম্পূর্ণ নারী কপিলার প্রাণ-চাঞ্চল্যের কাছে পরাভূত। মোহগ্রস্ত কুবের তাই সামাজিক শাসনকে উপেক্ষা করে কপিলাকে জড়িয়ে ধরে মেলা থেকে ফেরার পথে। কপিলার দেহ-মনের শূন্যতার কিছুটা পূরণ অবৈধভাবে সম্ভব হলেও, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত। সে জন্যে বিকল্প হিসেবেই কপিলার মনে পড়ে তার স্বামী শ্যামাদাসকে। ধর্ম ও সমাজ তার জন্যে স্বামী হিসেবে বরাদ্দ করেছে শ্যামাদাসকে। দুই পরিবারই নির্বাচনের কাজটি করেছে সমাজ ও ধর্মের পক্ষ থেকে। সমাজে বাস করে সেই বরাদ্দের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। সে জন্যে নিরুপায় কপিলা ফিরে গেছে শ্যামাদাসের খাঁচায়। সেখানে সে পরিচিতি পেয়েছে, কিন্তু পায় নি যথার্থ মর্যাদা। সে কারণেই ক্ষুব্ধ কপিলা কুবেরের বলয়ে ফিরে এসেছে। এসেছে মনেরই টানে। শ্যামাদাসের কাছে তার দেহের ক্ষুধা কিছুটা মিটলেও মন থেকেছে অতৃপ্ত। কুবের তার উভয় ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রার্থিত উৎস। এ সব কারণে কপিলা, শ্যামদাসের বাড়িতে, পরোক্ষভাবে কুবেরের কাছে প্রকাশ করেছে তার মনোভাব। সবার অগোচরে সে কুবেরকে বলেছে :

> চুপ কর মাঝি, বেবাকে শুনব। যাইবা যাও, ... দিদিরে কথাটা কইও ! কইও, কপিলা পরের ঘরের বৌ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই। অতিথ কই থাকব, অতিথ কী খাইব, কপিলারে কেডা তা জিগায় ? দুষী কইরো মাঝি, শাইপো কিন্তু এই কথাডা কইও-- দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইও। ...যাওগা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি![৯]

কপিলার প্রেম তৃষ্ণার কাছে সমাজ ও ধর্মীয় অনুশাসন শেষ পর্যন্ত যেন হয়েছে পরাজিত। বাপের বাড়িতে পুকুরে সে হয়ে ওঠে উদ্বেল। কুবেরের কাছে কপিলার এই সমর্পণে যেন মেলে তার মানসিক পরিতৃপ্তি। তাদের এই প্রেমের সম্পর্ক একটি অনিবার্য পরিণতির দিকে ছুটে গিয়েছে কুবেরের বিরুদ্ধে রাসুর মিথ্যা মামলার মধ্য দিয়ে। প্রেমের কারণে কুবেরের সঙ্গে কপিলার ময়নাদ্বীপ যাওয়াকে সঙ্গত ভাবা যায়।

কিন্তু অন্য ভাবে তা বেমানান। কারণ, আপন বোন মালা সম্পর্কে তার উদ্বেগহীনতা তাকে করেছে অসামাজিক ও নৈতিকতাশূন্য। কুবেরের সঙ্গে ময়নাদ্বীপ না গিয়ে স্বামী শ্যামাদাসের মধ্যে মনের ক্ষুধা মেটানোর উপকরণ খুঁজলে সে-ই হয়ত হতো কপিলার প্রকৃত আশ্রয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তার হৃদয়ের সায় না থাকায় সে যায় নি ঐ পথে। তা ছাড়া, শ্যামাদাসের এক সময়কার অবহেলা তার দেহমনে যে বিতৃষ্ণা তৈরি করেছিল তা অস্বীকার করা তার পক্ষে বোধ করি সম্ভব হয় নি।

হোসেন মিয়া 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ; উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র অনেক খানি তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এ উপন্যাসের পরিণতিও ঘটে তারই হাতে। সে তার আসল মতলব আড়াল করে জনগণের মধ্যে পরিচালনা করে তার সকল কার্যক্রম। তার সাফল্যের কথা কেতুপুরের সবাই জানে। কিন্তু সে কি সব করে অর্থ উপার্জন করে কেউ তা জানে না। কেউ কেউ অনুমান করলেও মুখে বলে না সে কথা। ময়নাদ্বীপ সম্পর্কেও মানুষ বেশি কিছু জানতে পারে না। মানুষ যতটুকু জানে তা হলো তার অতীতের কথা, কেতুপুরে প্রথম আগমনকালের হোসেন মাঝির কথা। তার সব ব্যবসা-বাণিজ্য অদৃশ্যে-অগোচরে হয় বলে সে মানুষের কাছে হয়ে ওঠে রহস্যময়। কেতুপুরের মানুষেরা তাকে ভালোবাসে সম্মান করে ; তবে তা তাদের মন থেকে নয়। ধনী হোসেন মিয়া তাদের কাছে ভয়েরও উৎস। হোসেন মিয়াকে তারা অনন্ত বাবুদের সমপর্যায়েরই ভাবে। অর্থ উপার্জন করে দরিদ্র জেলেদের মধ্যে নানাভাবে নানা কৌশলে সাহায্যের কারণেই সে একই সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাকে সে পর্যায়ে উপস্থাপিত করেছেন। সেদিনের হোসেন মাঝি আর আজকের হোসেন মিয়ার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। হোসেন মিয়াকে তারা অনন্ত বাবুদের মতো ভাবলেও সে ঠিক তাদের মতো নয়। সে তাদের সঙ্গে কোন দূরত্ব বজায় রাখে না। কেতুপুরের দরিদ্ররা সহজেই তাই হোসেন মিয়ার সাহচর্যে আসতে পারে। সে কেতুপুরের দরিদ্র মাঝিদের জীবনের সঙ্গে নদীর জলের মতোই যেন সম্পর্কিত। তবু সে কেতুপুরের জেলেদের কাছে আধেক জানা, আধেক অজানা। এই জানা-অজানার মধ্যে নিহিত হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ পরিকল্পনা। ময়নাদ্বীপ পরিকল্পনার প্রধান ভিত্তি কেতুপুরের দরিদ্র জেলেরা। ময়নাদ্বীপ যাওয়ার জন্যে সে কাউকে জোর করে না। ইচ্ছাকৃতভাবে যারা ময়নাদ্বীপ যেতে চায় সে তাদেরকেই সেখানে নিয়ে যায় পরম যত্নে। তবে মানুষ ভাগিয়ে নেওয়ার কৌশল সে জানে। যেন সে আসামের চা বাগানের কুলি ভাগিয়ে নেওয়ার আড়কাঠি। আমিনুদ্দি-নছিবনের মতো মৃতপ্রায় মানুষদের বিয়ে দিয়ে সেখানে সে বসতি বসায় ; সে ভাবে, তাদের মধ্য দিয়ে আগত সন্তানরাই গড়ে তুলবে ময়নাদ্বীপ রাজ্য। সে জন্যে সন্তান জন্মদানে অক্ষম বশিরকে হারাতে হয় তার ময়নাদ্বীপের বসতি, পাশাপাশি বশিরের তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে যুবক এনায়েতের অবৈধ সম্পর্ক নিমিষেই হয়ে যায় বৈধ। এর মূল কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ময়নাদ্বীপ রূপান্তরিত হবে জনপদে–এটাই আশা করে হোসেন মিয়া।

দক্ষ নাবিক হোসেন মিয়া ক্ষমতা ও বুদ্ধির সঙ্গে কৌশলও ব্যবহার করেছে তার ময়নাদ্বীপের স্বপ্ন পূরণের জন্যে। সে আসামীকে জেল থেকে মুক্ত করে পাঠিয়েছে ময়নাদ্বীপ। নিরক্ষর জেলেদের কাছ থেকে অনুকূল 'খত' লিখে নিয়ে সে তাদের ঘর তুলে দিয়েছে। আবার ঘরের খুঁটি বেয়ে চালের মধ্যে আফিম লুকিয়েও রেখেছে। এ সবই করেছে সে ময়নাদ্বীপ নামের রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। নিজের প্রয়োজনের বেলায় সে এমন কঠোর ও কৌশলী। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে সে অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে আফিম ও চোরাচালানের ব্যবসা করে। সে ময়নাদ্বীপের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আপস করে না কোথাও, ছাড়ে না কোন সুবিধাও গ্রহণ করতে। সুযোগ মতোই সে কুবেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে ময়নাদ্বীপ, সঙ্গে গিয়েছে কপিলা। এর পরে বঙ্কু, গোপী ও কুবেরের স্ত্রী-সন্তানদেরও সে ময়নাদ্বীপ নিয়ে যাবে। শেষ পর্যায়ে হোসেন মিয়া তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় কুবের ও সংশিষ্টদের ময়নাদ্বীপ পাঠাতে সক্ষম হলেও ময়নাদ্বীপ নামক এক ভুবন প্রতিষ্ঠা করতে সে সম্পূর্ণ সফলকাম হবে কি না বলা কঠিন। কখনও কখনও প্রতীয়মান হয় যে, হোসেন মিয়া যেন লেখকের মানস প্রতিনিধি। কিন্তু বিষয়টি তা নয় ; বাস্তববাদী লেখকের দৃষ্টিতে হোসেন মিয়া সমাজ বাস্তবতারই একটি প্রতিমূর্তি। ঔপন্যাসিক একটি ধূর্ত চরিত্রের রূপায়ণ করেছেন হোসেন মিয়া নামের ক্যানভাসে। মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলেই হয়তো প্রকৃতির প্রায় অসীম ক্ষমতাই জয়ী হয় কখনও কখনও। নিরন্তর শক্তিধর প্রকৃতির সঙ্গে হয়তো এঁটে উঠতে পারছে না হোসেন মিয়া। মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য মধ্য সাগরের এই দ্বীপ হোসেন মিয়ার এক স্বপ্নরাজ্য। ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় হোসেন মিয়াকে মনে রেখে বলা যায় :

> হোসেন মিয়া সুদূরের হাতছানি, সে অনাগত আগামীর সঙ্কেতবাহী, বর্জনে যেমন সে নির্মম গ্রহণে তেমনি আগ্রহী।[১০]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ছোট ছোট চরিত্রগুলো আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সেগুলোর বাস্তব ভিত্তি উপন্যাসকে দিয়েছে শৈল্পিক মর্যাদা। গণেশ, রাসু, পীতম, শীতল, জহর, আমিনুদ্দি, এনায়েত, সিধু, বশির প্রভৃতি সবার জীবনের সঙ্গেই রয়েছে পদ্মা নদীর নিবিড় সম্পর্ক।

গণেশকে ছাড়া কুবেরের পথচলা একাকীত্বে ভরা ; অন্য দিকে, কুবেরের ওপর গণেশের নির্ভরতা চরিত্রটিকে করেছে বাস্তবসম্মত। ময়নাদ্বীপ থেকে ফিরে আসা রাসুর হিংস্রতা ও স্বার্থপরতা অস্বাভাবিক ভাবা যায় না। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হারিয়ে বেঁচে আছে সে। কেতুপুরে ফিরে আবার সংসার সাজানোর উপলক্ষেই সে চুরি করেছে নিজের মামা পীতম মাঝির টাকা ভর্তি ঘট। গোপীকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে কুবের ; এই প্রতারণার কারণে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত রাসু কুবেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। তার এই হিংস্রতাও বাস্তবসম্মত।

পীতমের অহংবোধ, শীতলের লাম্পট্য, শঠতা আমাদেরই সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপ। সিধু দাসের প্রতারণার চিত্রটিও অপরিচিত নয়। আমিনুদ্দির জীবন বিপর্যয় এবং তার কিছুটা নিরাসক্ত জীবনধারা কাহিনীর সঙ্গে অনেকখানি সঙ্গতিপূর্ণ। ময়নাদ্বীপে এনায়েতের দুঃসাহসী কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সন্তান উৎপাদনে বশিরের অক্ষমতা। উপন্যাসের ছোট ছোট চরিত্রগুলো বাক্যস্থিত পদগুলোর মতো যেন পরস্পর-অন্বিত। এক জন ছাড়া অন্য জনের ভূমিকা হয়ে যায় নড়বড়ে। সমাজ তথা নারীর মর্যাদা নষ্ট করে যুগী হয় মুহুরীর রক্ষিতা। সচ্ছল জীবন কাটাতে গিয়ে তার এ ভিন্ন অন্য পথ নেই। কেতুপুরের অন্যান্যদের কাছে এ যেন স্বাভাবিক ঘটনা। উলুপী, গোপী এরাও বহমান কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র। বশিরের তরুণী স্ত্রী আরও বিশেষ ভূমিকায় উপস্থাপিত এ উপন্যাসে। তাকে ছাড়া ময়নাদ্বীপে মানুষ বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখা যায় না। একই ভাবে মমিনও উপন্যাসে পেয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। 'বাপজান', 'বাপজান' বলে তার কান্না আমাদের বেদনার্ত করে তোলে। আমাদের চৈতন্যে স্থান করে নেয় তার দুঃখক্লিষ্ট মুখ :

> আমিনুদ্দির মেয়ে যখন ঘাটে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নৌকা তফাতে সরিয়া গিয়াছে। বাপজান, বাপজান, বলিয়া আকুল হইয়া মেয়েটা কাঁদিতে লাগিল, নদীতে বুঝি সে ঝাঁপ-ই দিয়া বসে।[১১]

উপন্যাসের নাম 'পদ্মানদীর মাঝি'। স্বাভাবিকভাবেই, এ উপন্যাসে নদীর ভূমিকা মুখ্য হওয়ার কথা। এ উপন্যাসে পদ্মা তার শক্তিমান অস্তিত্ব নিয়েই তীরবর্তী মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তার প্রবাহের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন হয়েই দু-তীরের মানুষের বসবাস। পদ্মার অস্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে না বলেই এ উপন্যাসে পদ্মা একটি জীবন্ত চরিত্র যেন।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের পটভূমি উপস্থাপিত হয়েছে বাস্তব ও শিল্পসম্মতরূপে। কেতুপুর গ্রামে ভূ-স্বামীদের দখল করা জমিতে জেলেদের অধিকার নেই। পূর্ব পুরুষের সময় থেকেই তারা জেলে পাড়ার খুব ক্ষুদ্র পরিসরে ঘর তুলে জীবন যাপন করে। শত ইচ্ছা থাকলেও তারা এ পরিবেশের বাইরে যেতে পারে না। তাদের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মতো আর্থিক ও সামাজিক দৈন্যও দারিদ্র্যের একই দেয়ালে ঘেরা। দরিদ্র জেলেদের বেঁচে থাকার উপায় পদ্মা এবং পদ্মার সঙ্গে মিলিত খালগুলোতে মাছ ধরা। কেউ কেউ নৌকোয় মানুষ ও মালামাল পারাপারের কাজও করে। নদী-নির্ভর এই পেশা ছাড়া তাদের উপার্জনের অন্য কোন পথ নেই। বর্ষা ঋতুতে নদীর পানি বৃদ্ধি পায়, পদ্মা ও তার দু তীর প্লাবিত হয় ; নদীর তীরবর্তী মানুষেরা তখন হয়ে পড়ে অসহায়। জেলেদের আয় যায় বন্ধ হয়ে। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে তাদের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা। তাদের জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো অভাবের সে বাস্তব রূপ শুধু মালার আঁতুড়ঘরেই নয়, তা কুবেরের বাবার জীবনেও

ওতোপ্রোতভাবে ছিল জড়িয়ে। সে বঞ্চনার জীবন্ত ছবি কুবেরের ঘরের ঢেঁকিটির সঙ্গেও রয়ে গেছে। কেতুপুরের জেলেদের দরিদ্র জীর্ণ জীবনের সঙ্গে নদীর যে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তা উপন্যাসে উপস্থাপিত চিত্রসমূহের মাধ্যমে অত্যন্ত সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কুবেরের ঘরের ঢেঁকির ইতিহাস চিত্রে উপন্যাসের পরিবেশের রয়েছে সম্পর্ক :

> ছোট একটি নৌকায় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া হারাধন পদ্মা পার হইতেছিল। নদীর মাঝামাঝিপুরানো নৌকার তলাটা হঠাৎ কি করিয়া ফাঁসিয়া যায়। তখন আশ্বিন মাস, সেখানে পদ্মার এ-তীরের ও-তীরের ব্যবধান তিন মাইলের কম নয়। পদ্মা যাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে পদ্মার বুকে যত ঢেউ থাক মাইল দেড়েক সাঁতার দিয়া তীরে উঠা তার পক্ষে কষ্টকর কিন্তু অসম্ভব নয়। হারাধন একা হইলে ভাবনা ছিল না। কুবের আর একটু বড় এবং শক্ত-সমর্থ হইলেও সে বিপদে পড়িত না। কিন্তু ছেলে-মানুষ কুবের ভয় পাইয়া সাঁতার দিতে চাহে নাই, দিশেহারা হইয়া ক্রমাগত হারাধনকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন যে লম্বা কাঠের গুঁড়িটা হাতের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিল, হয়তো তাহা চিতা রচনার জন্যই কেহ শ্মশানে আনিয়াছিল। হারাধন কিন্তু কাঠটি ফেলিয়া দিতে পারে নাই, ঘরের আসবাবে পরিণত করিয়া সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছে।[১২]

হারাধনের সাংসারিক অভাবই নদীতে ভেসে যাওয়া কাঠকে কুবেরের সংসার পর্যন্ত নিয়ে এসে আসবাবে পরিণত করেছে। নদীর মধ্যে মৃত্যু মুখেও বেঁচে গেছে তারা। তাদের জীবন ধারার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে নদী যে, জন্ম-মৃত্যুর মতো অজানা অধ্যায়েও থাকে তার ভূমিকা।

এ বছর বন্যা ও বর্ষার পানি একত্র হয়ে ডুবে গেছে চিন্নার চর। গ্রামগুলো পাঁচ-সাতদিন ধরে পানির নীচে। কুবেরের শ্বশুর বাড়ি চরডাঙাও ডুবে গেছে পানিতে। বন্যায় ডুবে যাওয়া এলাকার মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না যেন। মাচা বেঁধে তার ওপর মানুষ ও পশু একত্রে বেঁচে আছে কোন মতে। এমন কি মায়ের কোল থেকে সন্তান ঘরের মধ্যে পানিতে পড়েও মারা গেছে। ফসলের জমিতে বোনা ফসল নষ্ট হয়েছে, ঘরে তোলা ফসলও জায়গার অভাবে গেছে নষ্ট হয়ে। মানুষ ও পশুর একত্রে বেঁচে থাকার এই করুণ দৃশ্য অবশ্য নদীমাতৃক বাংলায় প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায়। বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার সমুদ্র উপকূলে নদীর প্রমত্ততার সঙ্গে রয়েছে পদ্মার ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সম্পর্ক। চরডাঙায় বন্যার সময় মানুষের অসহায়ত্ব প্রসঙ্গে উপন্যাসের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

> মাচা হইতে বৈকুণ্ঠ, চালা হইতে অধর, মই হইতে কপিলা আর সাঁকো হইতে উলঙ্গ ছেলে- মেয়েগুলি নৌকায় আসিয়া আরাম করিয়া বসিল।[১৩]

বন্যার পানিতে ভাসমান এই দরিদ্র জনপদের জীবন বিপর্যয়ের চিত্র উপন্যাসের প্রতিবেশকে সমর্থন করে নিবিড় ভাবে। কুবের চরডাঙা থেকে কপিলাসহ অন্যান্য বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছে কেতুপুরে, তার শ্বশুরের সাময়িকভাবে হলেও সাহায্যের জন্যে। দারিদ্র্য-পীড়িত কুবেরের সংসারে এত মেহমান পরিণামে কুবেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। কপিলা কেতুপুরে এসে কুবেরের সংসারে নানা কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে চলছে। সে কুবেরের জন্যে নদীর ঘাটে আসে ঘরে ফেলে যাওয়া তামাক পৌঁছে দিতে। সে সময় কুবেরের প্রতি কপিলার মনে জেগে ওঠে প্রেম। নির্জন সন্ধ্যায় নদীর ঘাটের আবহাওয়া কপিলার প্রেমের সহায়ক। ভরা পদ্মার বুকে বয়ে যাওয়া বাতাস, ঢেউ, শেষ বিকেলের আকাশে ছড়িয়ে পড়া আলো কপিলার মনের ওপর প্রভাব ফেলেছে সহজেই। ফলে কপিলা হয়ে ওঠে অশান্ত। সে কুবেরের হাত ধরে টান দেয়। তাকে নৌকোয় নেওয়ার কথা বলে এবং 'আরে পুরুষ' বলে কুবেরের পৌরুষকে ব্যঙ্গ করে। কপিলার প্রেমের এই অসংযত প্রকাশে প্রকৃতি ও নদীর রয়েছে ভূমিকা এবং তা উপন্যাসের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের শর্ত পূরণ করেছে।

নদীর ওপর নির্ভরশীল জেলেদের জীবন পদ্মা ও তার প্রকৃতির মধ্যেই যেন আবর্তিত। নদীই তাদের জীবনের আশা-নিরাশার দুই মেরু। নদীতে মাছ ধরে তারা জীবন চালায়, আবার বন্যায় নদীর পানিতে ভেসে গিয়ে তারা সর্বস্ব হারায়। কখনও বন্যার সঙ্গে ঝড় বয়ে নিয়ে আসে তাদের জীবনে মহাদুর্গতি। এমনই এক ঝড়ের ছোবলে বিপর্যস্ত হয়েছে কেতুপুরের জেলেরা। বন্যা তাদের সর্বনাশ করেছে। প্রায় প্রতিটি ঘর-বাড়িই পড়েছে ঝড়ের কবলে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমিনুদ্দির, তার স্ত্রী-সন্তান গাছের নীচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। পায়ে আঘাত পেয়ে অচল হয়েছে গোপী। কেতুপুরের মানুষের এমন দুর্দিনে হোসেন মিয়া এসেছে তাদের সাহায্য করার জন্যে। সে ময়নাদ্বীপ গড়ার জন্যে সবই পারে। তাই হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপ-পরিকল্পনা মাথায় রেখে ঋণ দিয়ে টিপসই নিয়ে তাদের ঘর তুলে দিয়েছে। এ ভাবে ধারে বাঁধা পড়া মানুষগুলোই হয়ে পড়বে আরও অসহায় এবং তখন ময়নাদ্বীপ যাওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না—এই লক্ষ্যে হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে এক সুদূরপ্রসারী নক্সা। ময়নাদ্বীপের ভিত্তি গড়ার ক্ষেত্রে হোসেন মিয়াকে সাহায্য করেছে প্রাকৃতিক ঝড়-জলোচ্ছ্বাস। নদীতে তুফান আর ডাঙায় ঝড়ের কবলে ক্ষতিগ্রস্তদেরই ঋণ দেয় হোসেন মিয়া এবং তাদেরকেই সে ময়নাদ্বীপ নিয়ে যাওয়ার কৌশল করে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বিপন্ন মানুষগুলোর হোসেন মিয়ার সাহায্য নিতে বাধ্য হওয়া এ সবই হোসেন মিয়ার অনুকূলে।

কুবের হোসেন মিয়ার সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ দেখতো সন্দেহের চোখে। কিন্তু যে দিন সে অর্থ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য চাকরি নেয় তার নৌকোয়, সে দিন থেকেই কুবের হয়ে পড়ে হোসেন মিয়া-নির্ভর। পদ্মার উজান ভাঁটায় কুবের নৌকা নিয়ে চলাচল

করেছে ; এমন কি ময়নাদ্বীপও গিয়েছে সে। এ ভাবে কেতুপুরের বাইরেও বৃহৎ পানি অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে কুবের, গণেশ ও অন্যান্যদের। এই পানি অঞ্চল কেতুপুরের বাইরে হলেও তা উপন্যাসের পরিবেশ ব্যাহত করে নি। কুবেরদের সঙ্গেও হোসেন মিয়া সারারাত মেঘনার মোহনার দ্বীপগুলো সম্পর্কে গল্প করে এবং ময়নাদ্বীপে পৌছানোর পথ নির্দেশ করে। চতুর্দিকে পানিবেষ্টিত অঞ্চলের মাঝে জেগে ওঠা ক্ষুদ্র দ্বীপগুলো ভাসমান ভেলার মতো। ময়নাদ্বীপও তেমনি একটি দ্বীপ। ময়নাদ্বীপের ভৌগোলিক পরিচিতি উপন্যাসের পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুকূল :

> দ্বীপের খানিকটা ডিম্বাকৃতি, খানিকটা ত্রিকোণ। দ্বীপের দীর্ঘতম পরিসর প্রায় এগার মাইল—হোসেন নিজে মাপিয়া দেখিয়াছে। দ্বীপে যেখানে নৌকা ভিড়িয়াছিল, সেদিকে খানিকটা অংশ পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপিত হইয়াছে, চাষ হইতেছে, বাকি অংশ জঙ্গলে ঢাকা। পশ্চিম দিকে অসংখ্য নারিকেল গাছ, সমস্ত দ্বীপে ছড়াইয়া না পড়িয়া গাছগুলি একস্থানে ঘন হইয়া মাথা তুলিয়াছে কেন, বোঝা যায় না।
>
> জমি অত্যন্ত নীচু, এত নীচু যে আশঙ্কা হয় যেদিন খুশী হইবে সেই দিনই সমস্ত দ্বীপটিকে সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিবে। দ্বীপের মাঝখানে এক মাইল পরিমিত একটা লোনা জলা আছে, সমুদ্রের চেয়েও ওখানটা বুঝি নীচু, খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দিলে সমুদ্রের জল আসিয়া ভরিয়া ফেলিবে।[১৪]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের পরিবেশে অনির্দেশিতভাবেই নদী ও প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। নদী ও প্রকৃতির অনুগত একদল মানুষ এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সে মানুষেরাই হোসেন মিয়ার সঙ্গে বসবাসের অনুপযুক্ত ময়নাদ্বীপে গিয়েছে। এবং সে স্থানটির অবস্থা হলো :

> কেতুপুরের তীরবর্তী পদ্মার সঙ্গে সংশিষ্ট মেঘনা ও তার বুকের বিস্তৃত জলরাশি অতিক্রম করে নদীর বুকে জেগে উঠা তীর ময়নাদ্বীপ অতিসাধারণ, জনহীন, সুবিধাহীন।[১৫]

উপন্যাসটির বর্ণনা অংশে সাধু ও চলিত গদ্যরীতির মিশ্রণ মাঝে মধ্যে লক্ষ করা গেলেও তার গদ্য সাধারণভাবে ত্রুটিহীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা উপন্যাসের একাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের গদ্য সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ যেন তাঁদের একটি অভ্যাস। হয় তাঁরা বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য লিখতে সক্ষম নন, না হয় তাঁরা ইচ্ছে করেই এ কাজটি করেছেন। তাঁদের এই ইচ্ছা হয়তো প্রভাবিত হয়েছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালীদের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। এ কথা বলা হয়তো বেমানান হবে না যে, 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে লেখক বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষযোগ্য যে, সাধারণ বাঙালীরা সাধু-চলিত মিশ্রিত ভাষাই বেশি ব্যবহার করে থাকে। সে সময় সাধু-চলিত

রীতি মিশ্রিত গদ্যে উপন্যাস রচনা করা হতো : সাধু রীতিতে রচিত সংলাপেরও বহুল প্রচলন ছিলো। শিক্ষার মাধ্যম সাধুরীতির গদ্য থাকায় পাঠকবৃন্দের সাধু রীতির প্রতি আগ্রহ অস্বাভাবিক নয়। প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'ও রয়েছে সাধু ও কথ্য রীতির মিশ্রণ। স্পষ্ট করেই বলা যায় 'আলালের ঘরের দুলাল' বইটি আসলে সাধু রীতিতেই রচিত। পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরাও সাধু-চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে যেন একটা মিশ্র ভাষা তৈরি করেছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সাধু ও চলিতের মিশ্রণ করতে গিয়ে 'তাহার' স্থানে 'তার', 'যাহার' স্থানে 'যার', যাহাকে তাহাকে'র স্থানে 'যাকে তাকে', 'ধরিবার' স্থানে 'ধরার', 'কাহারও' স্থানে 'কারো' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেছেন সাধুরীতির বাক্যের মধ্যে। যেমন :

ক. পদ্মায় ইলিশ মাছ *ধরার* মরসুম *চলিয়াছে*।[১৬]

খ. শরীর *থাক* আর *যাক*, এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে *বসিয়া থাকিলে* কুবেরের *চলিবে* না।[১৭]

গ. দুখানা কুঁড়ে *যার* সম্বল *তার* স্ত্রী আর কোথায় সন্তানকে জন্ম *দিবে*।[১৮]

ঘ. *তার* যতখানি সাধ্য সে *তা করিয়াছে*।[১৯]

ঙ. সোনাখালির একটি পাত্র হোসেন ঠিক *করিয়া* দিয়াছে গোপীর জন্য, নাম *তার* বঙ্কু, বয়স বেশী নয়। এ জগতে বঙ্কুর আপনার *কেহ* নাই বটে কিন্তু হোসেন মিয়া আছে। হোসেন মিয়া *যার* মুরব্বি, কিসের অভাব *তার ?*[২০]

যে কোন বাংলা উপন্যাসের মতো 'পদ্মানদীর মাঝি'তে তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দুর্বোধ্য তৎসম শব্দ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পারতপক্ষে ব্যবহার করেন নি। তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে, সে সময় সরল ও সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো, মানিক নিজেও ঋজু ও সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার পছন্দ করতেন। বিষয়টি যাচাই করার জন্যে উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদের একটি করে পৃষ্ঠার শব্দাবলি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তাতে আমাদের বক্তব্যই প্রমাণিত হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত শব্দ প্রায় দেড় শ থেকে দুশ। দেখা যায় কোন পৃষ্ঠাতেই তিনি বিশ পঁচিশটির বেশি তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নি। এখানে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোতে ব্যবহৃত পাঁচটি তৎসম বা তৎসমজাত শব্দের উলেখ করা হলো : প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ১: বর্ষার, দিবারাত্রি, অনির্বাণ, রহস্যময় দুর্বোধ্য; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ১৮: পর্যন্ত, স্থলপথ, জলপথ, প্রথম, পণ্য; তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ৪৮: অকারণ, ত্রাসে, বিপদ, রাত্রে, প্রকাণ্ড; চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ৬৭: গতি; আবদ্ধ, নীভূত, শয্যায়, স্বপ্ন; পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ৭৩: প্রবল, বৃষ্টি, নিবিড়, গর্জন, বেগ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ৯৫: দাসী, ঘুমন্ত, স্নান, লজ্জা, স্বামী এবং সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা: ১০৩: সন্দেহ, চিন্তিত, চিরদিন, বপন, জীবিকা ইত্যাদি।

লক্ষযোগ্য যে, তিনি পারত পক্ষে এমন কোন তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নি যে গুলো সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই বহু লেখকের রচনায় বার বার ব্যবহৃত এবং সে কারণেই সকল পাঠকেরই নিত্য পরিচিত। যে সব তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন সে গুলো একই ভাবে সহজবোধ্য এবং পাঠকের অনুধাবন সীমার অন্তর্গত। বস্তুত, তাঁর লক্ষ্য ছিলো প্রায় প্রত্যেক পাঠকের কাছে বক্তব্য পৌঁছানো। সে কারণে তাঁর শব্দ ব্যবহারে সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা প্রাধান্য পেয়েছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মা ও জেলেদের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির অধীন অসহায় মানুষের অবস্থা মূর্ত হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষায়। সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ চরিত্রে আরোপ করেছে বাস্তবতা ও শৈল্পিক সুষমা। উপন্যাসটির ভাষার বৃহত্তম অংশ জুড়ে রয়েছে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সংলাপ। চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত এ ভাষা ও সংলাপ উপন্যাসের গতিকে করেছে প্রবহমান। তবে, উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা নিপাট আঞ্চলিক নয়, ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই সব মানুষের বোধগম্য আঞ্চলিক শব্দাবলি নির্বাচন করেছেন। সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে চরিত্রে আরোপিত হয়েছে বাস্তবতা ও শৈল্পিক গুণ। মানব রিপুর বহিঃপ্রকাশে অনেক আঞ্চলিক শব্দ হয়েছে খুবই মোক্ষম। গীতগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক ভাষা। ঔপন্যাসিক প্রায় নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন পদ্মার জেলেদের পেশাগত ভাষা। তরঙ্গায়িত শব্দের সাহায্যে তারা ব্যবহার করে সাংকেতিক ভাষা। ধ্বনি-তরঙ্গ-নির্ভর এ ভাষা পদ্মার মাঝিরা সহজেই বুঝতে পারে। অন্যান্য দেশে নিশ্চয়ই জেলেদের মধ্যে এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা চালু আছে। পদ্মায় ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দগুলো জেলেদের জীবনের সঙ্গে যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশিষ্ট। যেমন, শ্লেষ মিশ্রিত আঞ্চলিক ভাষায় নকুল কুবেরকে বলে :

> শ্যাষ রাইতে তর বৌ খালাস হইছে কুবির। ...তুই ত দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা ? ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।[২১]

মানব-সম্পর্কের প্রতিটি বিষয় প্রকাশেই সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সংলাপ। বাপের বাড়িতে পুকুরে কপিলা কুবেরকে বলেছে :

> ক্যান মাঝি ক্যান ? আমারে ভাব ক্যান ? সোয়ামীর ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি—পুরুষের পরাণ পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি ; ভুইলো আমারে। ছাড় মানুষ আহে।[২২]

'পদ্মানদীর মঝি' উপন্যাসটির ভাষা সম্পর্কে আলোচনা কালে উলেখ্য যে :

> ...মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের উপভাষাও ব্যবহার করেছেন, আবার পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন উপভাষা চরিত্রের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে (পরিপ্রেক্ষিতে?) দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ... দেখা যাচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চল থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী যশোর, খুলনা অঞ্চলের উপভাষার যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি আবার পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, কুমিলা এবং ঢাকা জেলার উপভাষাও ব্যবহার করে তাঁর চরিত্রগুলোকে আরও বিশ্বস্ত করে তুলেছেন। আবার পাহাড়ী অঞ্চলের বিশেষ পেশার মানুষের মুখের ভাষাও হুবহু উচ্চারিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে।[২৩]

বলাবাহুল্য, অনুরাগের এমন শিল্পসম্মত প্রকাশে আঞ্চলিক ভাষা কোন অন্তরায় হয় নি। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে গ্রথিত দুটি গীতের কথায়ও রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা। গীত দুটো আঞ্চলিকতার সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যকেও স্মরণ করিয়ে দেয় :

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি,
উঠ্যা দেখবা না। ...
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ-নাও
দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও? ...
মাঝি কত ঘুমাইবা।

এবং

পিরীত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই!
আগুন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ!
আ লো সই!
থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ন ভাইজা করে খৈ।
আ লো সই।[২৪]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে যারা কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ গিয়ে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছে, তারাও পারে নি সেখানে কোন আলাদা ভাষা তৈরি করতে। কেতুপুর

ও ময়নাদ্বীপের ভাষা একই। প্রত্যেক মানুষই বহন করে তার মাতৃভাষা। কেবল কেতুপুরের মানুষই যদি বসতি গড়ে তোলে ময়নাদ্বীপে, তা হলে সেখানকার ভাষাও যে হবে কেতুপুরের ভাষাই তা সহজবোধ্য।

'পদ্মানদীর মাঝি'তে লেখক প্রয়োজন মতো অনুপ্রাস, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। তবে সেগুলোর পরিমাণ বেশি নয়। এ ধরনের উপাদান ব্যবহারের সময় লেখক বেশি লক্ষ করেছেন সেগুলোর অর্থময়তা। খিলখিল, সাঁসাঁ, ফুটফুটে, ছমছম, থৈ থৈ, খাঁ খাঁ, কনকন, হাউমাউ, বিড়বিড় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের ঐ মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। অনেক সময় দ্বিরুক্ত বা দ্বৈতশব্দ বাক্যের ধ্বনি মাধুর্য এবং অর্থের গৌরব বৃদ্ধি করে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বহু শব্দদ্বৈত বাক্যের ধ্বনি মাধুর্য ও অর্থের স্পষ্টতা সৃষ্টিতে পালন করেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। ঘুরিয়া ঘুরিয়া, মাঝে মাঝে, কাঁপিতে কাঁপিতে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, বলিতে বলিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, হাঁটিতে হাঁটিতে, মাখিতে মাখিতে প্রভৃতি শব্দদ্বৈত এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এ উপন্যাসের বাক্যের মধ্যে আছে বহু অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা। বিভিন্ন শব্দে একই আদ্যক্ষর থাকার কারণে তৈরি অনুপ্রাসের সুর বাক্যের মধ্যে ছড়ায় কাব্যিক সৌরভ। 'সংকীর্ণ সংসার' এর মত অনেক অনুপ্রাসজাত বাক্যাংশ রয়েছে এ উপন্যাসে। আলোচ্য উপন্যাসের শৈল্পিক সৌষ্ঠব নির্মাণে উপমা-চিত্রকল্পের রয়েছে উলেখযোগ্য অবদান। নিম্নে কয়েকটি উপমা প্রয়োগের নমুনা দেওয়া হলো :

ক. মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নিলাভ মণির মত দেখায়।[২৫]

খ. পাখির ছানার মত অবসন্ন ছেলে দুটি।[২৬]

গ. বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য কপিলা।[২৭]

এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের উক্তি উলেখ করা যায়। তিনি বলেছেন :

প্রতীকধর্মিতা আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২৮]

প্রায়ই সাধু ও চলিত রীতিমিশ্রিত একটি তৎসম-তদ্ভব-দেশী-বিদেশী ও আঞ্চলিক শব্দে সমৃদ্ধ ভাষা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কমনীয় গদ্যশৈলী। তা ছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, উপমা প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার এর গদ্যশৈলীকে দিয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ শিল্প-সুষমা। বস্তুত, বস্তুবাদী ও বাস্তববাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি এ উপন্যাসকে যেন দিয়েছে অনন্য শৈল্পিক গৌরব। লেখক ইচ্ছা করলে এ উপন্যাসের পরিচ্ছেদ বৃদ্ধি করতে পারতেন ; এমন কি সাতটি পরিচ্ছেদেই তিনি আরও বর্ণনা সংযোজন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি ; বরং নির্মোহ দৃষ্টিতে পরিমিত পরিসরে তার প্রায় হুবহু চিত্র তিনি এঁকেছেন এ উপন্যাসে। ফলে উপন্যাসের ভাষাশৈলী লাভ করেছে এক অসাধারণ শিল্প-মর্যাদা। এ প্রসঙ্গে জসীম উদ্‌দীনের 'নক্‌শী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি উল্লেখ করা যায়। ট্রাজিক এ কাহিনী-কাব্যটি রচিত হয়েছে মাত্র তেরটি কবিতা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বিশ্বের

শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যেও এই পরিমিতি বোধ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বিবেচনায় আনা যায় :

> মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, এক ছেলের মুখে স্তন গুঁজিয়া রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর শখ মালার একার নয়, এমনিভাবে খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না। আর হ, মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই এ সময়টা সে যে কত বড় নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। লখা ও চণ্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা-ভিজা গায়ের চামড়া। ডিবরির শিখাটি ঊর্ধ্বগ ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরের চাল পচা শণের, চারি পাশের দেয়ালে চেরা বাঁশের স্যাঁতসেঁতে ঢেউতোলা মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার।[২৯]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ভাষা ও সংলাপ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> কখনো বিবৃতির, কখনো ভাষা টিপ্পনির। সাংবাদিকের টীকা, বৈজ্ঞানিকের প্রতিবেদন, চিকিৎসকের নির্ণয়গ্রাহী মন্তব্য, একই সঙ্গে এ ভাষার সম্বল। লেখক কখনো চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছেন, চরিত্রের সংলাপকেই কখনো লেখকের মন্তব্যে অনূদিত করে দিয়েছেন।
>
> আবার কখনো চরিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে চরিত্রের ভিতরটাকে এক নজর দেখিয়ে দিয়েছেন কোন সংকোচ ভণিতা না করেই–নিজেই নিজের সৃষ্ট চরিত্রের অসংগতি নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন–যেন তিনি স্রষ্টা নন, নিছক দ্রষ্টা মাত্র।[৩০]

'পদ্মানদীর মাঝি'র মনোহরী ভাষা আসলে কোন কৃত্রিম ব্যায়ামসৃষ্ট নয়। এ ভাষা ছিল ঐ এলাকার মানুষের মুখে, ছিল যেন মানিকের হৃদয়েও। সে কারণেই এ উপন্যাসটির ভাষা লাভ করেছে অপরূপ এক শোভা। একজন সমালোচকের ভাষায় :

> যে ভাষা ঘটিরাম ডেপুটির মুখে পশ্চিমবঙ্গে কেরিকেচারের 'অপভাষা' হয়েই বিরাজ করছিল, সেই ভাষাই সাহিত্যের সুখ-দুঃখের বাহন হয়ে দেখা দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাপার, তার ব্রাত্য মানুষ সজীব হয়ে উঠল। মানিক এদের চিনতেন, এদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম দরদ, তাই এই অমর রূপায়ণ সম্ভব হল। তিনি বলেছেন, বালিকা বালিগঞ্জে, অসংস্কৃত লেকের ধারে বসে তিনি ভাবতেন এদের কথা। 'ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, গ্রামের ধারে বসানো গ্রাম–চাষী, মাঝি, জেলে তাতীদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ, ... ঐ মুখগুলি

আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাত—ভাষা দাও, ভাষা দাও।' তাই ভাষাই তিনি দিলেন—আর তা অমর ভাষা। পরিবেশে এল বাস্তবতা।[৩১]

সার্থক ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের পরিচয় মেলে তাঁর রচনায়। কাহিনী, চরিত্র, ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে লেখকের জীবনাদর্শের ছাপ পড়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের কথা উল্লেখ করা যায় :

ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ গড়ে ওঠে তাঁর সময় জ্ঞান, ইতিহাস জ্ঞান এবং ব্যক্তি-মানুষের জ্ঞান ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে। লেখকের এই সামগ্রিক জ্ঞানই জীবন দর্শন রূপে প্রতিফলিত হয় উপন্যাসের প্রতিটি অংশে।[৩২]

বাস্তবতার ভিত্তিতে লেখকের নিবিড় দৃষ্টির অন্তরঙ্গ আলোকে উন্মোচিত হয়েছে কেতুপুরের জেলেগোষ্ঠীর জীবনচিত্র এ উপন্যাসে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মানুষের আশা-সংগ্রাম, সফলতা-ব্যর্থতার কথা বলেছেন। এবং সেটাই প্রার্থিত। একজন সমালোচক বলেছেন :

উপন্যাসের প্রথম ও শেষ অন্বিষ্ট মানুষ, তার জীবন। সুতরাং উপন্যাস জীবন সংলগ্ন আলেখ্য।[৩৩]

এ আলেখ্য নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নির্ভরশীল হয়েছেন :

তাঁর শৈশব থেকে ঘুরে ঘুরে দেখা বাংলার মানুষের বাস্তব জীবনের উপর। সে জীবন সংগ্রামের কঠোর নগ্ন বাস্তবতা।[৩৪]

পদ্মা তীরবর্তী জনগোষ্ঠী জেলেদের জীবন বঞ্চনার রহস্যই যেন উন্মোচিত হয়েছে হোসেন মিয়ার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। হোসেন মিয়াও এক ধরনের সামন্ত-অবশেষ, সে কৌশলে শোষণ করে জেলেদের ; বিভিন্ন অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করে প্রভাব বিস্তার করে জেলেগোষ্ঠীর জীবনে। মেজকর্তা ও হোসেন মিয়া দুই শোষকের ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও শোষিতদের জন্য তা একই রকম বিষময়। হোসেন মিয়া নিজ উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ময়নাদ্বীপ নামের এক সাম্রাজ্য। হোসেন মিয়ার সারা জীবনের ন্যায়-অন্যায় সব কাজের মূলে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এই ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। হোসেন মিয়ার জীবন সংকল্পের এই বাস্তবতার সঙ্গেই তুলনীয় বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস-প্রবণতা। কেউ কেউ ময়নাদ্বীপকে মনে করেছেন 'ইউটোপিয়া'; এবং ঐ ইউটোপিয়ার কল্পকার ও রূপকার হচ্ছে হোসেন মিয়া। এ বিষয়টি আজও রয়ে গেছে রহস্যময়। সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া-প্রীতির উল্লেখেই তার চরিত্রের ব্যাখ্যা কার্য শেষ করতে চাই বলে হোসেন মিয়ার সম্যক তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়

> না। ...হোসেন মিয়ার মত কল্পনাসিদ্ধ চরিত্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্রমালায় আর একটিও নেই।[৩৫]

আর একজন সমালোচক হোসেন মিয়ার আমূল রূপান্তর হয়েছে বলে মনে করেন। ঐ 'ইউটোপিয়া'য় শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে যাঁরা মনে করেন বোধ করি তাঁদেরই সমর্থনে তিনি উলেখ করেছেন যে, " 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিয়ার ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সাধিত হলো অহিংসার সত্যানন্দে...।"[৩৬] একজন তরুণ সমালোচকও 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ময়নাদ্বীপের প্রতীকে অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী... সমাজের আভাস দিয়েছেন'[৩৭] বলে মন্তব্য করেছেন।

সমালোচকদের এ সব মন্তব্য শিথিল হয়ে যায় যখন হোসেন মিয়াকে মতলববাজ বলে মনে হয়। সে তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে ধারাবাহিকভাবে লিপ্ত হয়েছে নানা অপকর্মে। হোসেন মিয়া আফিমের চোরাকারবারী। এটি নৈতিক স্খলনের প্রমাণ। অথচ সুযোগ বুঝে সে আবার ঝড় বিধ্বস্ত কেতুপুর-বাসীর ভাগ্য বিধাতা রূপে প্রতিষ্ঠা পাবার অপচেষ্টা করেছে। সে জেলেদের বিপদে টাকা দিয়েছে, ঘর তুলে দিয়েছে। কিন্তু সুযোগ মতো খতে টিপসই নিতে ভুল করে নি। এই খত আসলে দাসখত, এই খত জেলেদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার এক নিশ্চিত কৌশল। এখানেই হোসেন মিয়ার চাতুর্য ও প্রতারণা ধরা পড়ে। এ জাতীয় ঋণ ব্যবস্থাকেই দাদন বলা হয়। এক ধরনের চতুর লোক এই দাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ সরল মানুষকে ঠকিয়ে টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। এই ব্যবস্থা রদ করার জন্য শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের চেষ্টায় আইনসম্মতভাবে গঠিত হয় ঋণসালিশি বোর্ড যার মাধ্যমে বহু ঋণগ্রস্ত মানুষ হয় ঋণমুক্ত। হোসেন মিয়ার দাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> তারপর একখানা খত বাহির করিয়া বলিল, টিপসই দেও কুবির–একুশ টাকা দশ আনার খত লিখিছি–বাদ দিছি দুই টাকা। টিপ সই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিবা–না দিলি মামলা করুম না বাই! – হোসেন মিয়া মৃদু হাসিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির? লিখা থুইলাম, হিসাব থাকব–না-ত কিসির কাম খত দিয়া?[৩৮]

জীবনযাত্রার অনুপযোগী সামুদ্রিক দ্বীপ ময়নাদ্বীপ নামের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার রূপে হোসেন মিয়া কেতুপুরের গরীব জেলেদের ব্যবহার করেছে। নিষ্ঠুরের মতো সে নির্বাসনে পাঠিয়েছে কেতুপুরের দরিদ্র জেলেদের। হোসেন মিয়ার কাছে তারা যেন দাস শ্রমিক। ময়নাদ্বীপের সামাজিক নিয়ম-কানুন শিথিল, ধর্মীয় বিধি-বিধানের নেই বিশেষ কোন বালাই। যে দিন ময়নাদ্বীপ উপযুক্ত হবে মনুষ্য বসবাসের, সে দিন তৈরি হবে কঠোর জীবনবিধানও। হোসেন মিয়ার স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় দেখা যায় অর্থের কাছে সকলের পরাভব মানার দৃশ্য। কুবের মাঝি হোসেন মিয়ার সাহায্যকে দেখতো সন্দেহের চোখে, সে আজ হোসেন মিয়ার নৌকার প্রধান মাঝি। কুবের আজ

হোসেন মিয়ার স্বপ্ন পূরণের সহায়ক উপকরণ যেন। অর্থের কাছে, হোসেন মিয়ার ক্ষমতার কাছে কুবের বার বার হেরেছে, সে তার কন্যা গোপীকে তাই হোসেন মিয়ার পছন্দের ছেলে বঙ্কুর সঙ্গে দিয়েছে বিয়ে। এই অর্থ-ক্ষমতার কাছে নিবেদিত সকলেই, এমন কি যোগীও অর্থলোভে হয়েছে সম্পদশালী মুহুরীর যৌনাকাঙ্ক্ষার দাসী। যৌনতার স্পষ্ট প্রাধান্য উপন্যাসে না থাকলেও উপন্যাসের গভীরে রয়েছে তার প্রভাব। যৌনতা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করলেও তজ্জাত অতৃপ্তি মানুষের জীবনে গভীর শূন্যতা তৈরি করতে পারে। সে রকম শূন্যতা বহন করেই কপিলা কেতুপুরে আসে। কপিলার রঙ্গ-রসধর্মী আচরণে কুবের মুগ্ধ হয়, ফলে পঙ্গু নারী মালার ভক্তিপূর্ণ প্রেমের আবেদন ক্রমে কুবেরের কাছে আসে কমে। এ ছাড়া মালাকে জড়িয়ে মেজকর্তার প্রসঙ্গ কুবেরকেও করে মাঝে মাঝে উত্তেজিত, কপিলার সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ার কারণে তা ওঠে আরও জ্বলে। সে কারণেই কুবের কপিলার দেখা পেতে ছুটে যায় আকুরটাকুর। কুবের ও কপিলার প্রেম অবশেষে গন্তব্যের পথে যাত্রা করে পুলিশের ভয়ে। রাসুর প্রতিহিংসা কুবেরকে জড়িয়েছে পুলিশি মামলার ফাঁদে। এ মামলা-জেল-জরিমানা থেকে বাঁচতেই শেষাবধি কুবের কপিলাকে সঙ্গে করে হোসেন মিয়ার তত্ত্বাবধানে ময়নাদ্বীপে যায় পালিয়ে। নিজ স্ত্রী-সন্তান-চেনাজন, সমাজ-সংসার ফেলে মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত ময়নাদ্বীপ মেনে নেয় কুবের।

কেতুপুরের দরিদ্র মাঝিদের জীবনে বঞ্চনার পটভূমি তাদের গরিবী জীবন। এই গরিবী জীবনের ওপর হোসেন মিয়ার প্রভুত্ব কেতুপুরবাসীর জন্যে সুখের হয় নি। অর্থ-ক্ষমতা-যৌনতা সব কিছুতেই হয়রানির শিকার তারা। ধূর্ত হোসেন মিয়া সমাজ বাস্তবতার মূর্ত প্রতীক, তার-ই মনোবাসনা পূরণের জন্যে তার-ই তৈরি বলয়ে ঘুরপাক খেয়েছে কেতুপুরের নিঃস্ব অসহায় মানুষগুলো। তাদেরই মর্মবেদনায় বিদ্ধ ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ ; এবং সে বাস্তবতারই প্রায় মহাকাব্যিক কাহিনী ‘পদ্মানদীর মাঝি’।

তথ্যপঞ্জি :

১. বিশ্বনাথ দে (সম্পা.), *মানিক বিচিত্রা*, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৭২-৭৩
২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পদ্মা নদীর দ্বিতীয় মাঝি, (*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, সম্পা., ভূঁইয়া ইকবাল), ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৯
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৫১৬
৪. *মানিক গ্রন্থাবলী*, ১ম ভাগ, আলোচনা ও গ্রন্থপরিচয়, গ্রন্থ পরিচয় : আশোক গুহ, কলকাতা, ১৩৭০ পৃ.ধ
৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৯
৬. ঐ, পৃ. ১৪৮
৭. ভূঁইয়া ইকবাল, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (সম্পা.) ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৬

৮. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৯
৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
১০. অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, *আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস*, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৮১
১১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯
১২. ঐ, পৃ. ১৫-১৬
১৩. ঐ, পৃ. ৬১
১৪. ঐ, পৃ. ১২৭-১২৮
১৫. আশিস কুমার দে, *উপন্যাসের শৈলী*, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৭
১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১
১৭. ঐ. পৃ. ৪
১৮. ঐ, পৃ. ২০
১৯. ঐ, পৃ. ২১
২০. ঐ, পৃ. ১৬০
২১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
২২. ঐ, পৃ. ১৬৭
২৩. সালিম সাবরিন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ব্রাত্যজীবন*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৩-৭৪
২৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০, ১১৪
২৫. ঐ, পৃ. ১
২৬. ঐ, পৃ. ৫৭
২৭. ঐ, পৃ. ১৭২
২৮. রামেশ্বর শ', *আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৮১
২৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮
৩০. নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.), *মানিক সাহিত্য-সমীক্ষা*, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৯৭
৩১. *মানিক গ্রন্থাবলী*, ১ম ভাগ, আলোচনা ও গ্রন্থ পরিচয়, গ্রন্থ-পরিচয় : অশোক গুহ, কলকাতা, ১৩৭০, পৃ. ধ
৩২. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭০
৩৩. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য সন্ধান*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১০০
৩৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য করার আগে, মানিক গ্রন্থাবলী,* ১২শ খণ্ড, কলকাতা ১৯৭৫, পৃ. ৫৬০
৩৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৭৮-২৭৯
৩৬. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৩৭
৩৭. সালিম সাবরিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩
৩৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০